শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ও সরকারের ব্যর্থতা

দিবাকর পাল

অবৈধ অস্ত্রধারীদের অব্যাহত সন্ত্রাসের দরুন দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সন্ত্রাসীদের নিকট জিম্মি হয়ে পড়েছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সন্ত্রাস বর্তমানে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সামান্য কথা কাটাকাটি থেকে হাতাহাতি, পরবর্তীতে একে অন্যকে অস্ত্র প্রদর্শন, সর্বোপরি দু'দলে বন্দুকযুদ্ধ। আবার হয়তো ছাত্র সংসদ নির্বাচন; নির্বাচনে অংশগ্রহণ প্রশ্নে মতানৈক্য, উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের জের হিসাবে ছাত্র-সংঘর্ষ। সর্ব ক্ষেত্রেই পেশীশক্তি প্রদর্শনের প্রতিযোগিতার ফলে ছাত্রসমাজের গ্রহণযোগ্যতা দেশের মানুষের নিকট ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ছাত্র নামধারী মাস্তানদের হাত থেকে শিক্ষকবৃন্দরাও নিষ্কৃতি পাচ্ছে না।

অথচ ১৯৬৬ সালের ছয় দফা থেকে শুরু করে '৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান এবং সবশেষে '৭১-এর মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাদের ছাত্রসমাজের অবদান স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে। এছাড়াও স্বাধীনত- উত্তর বাংলাদেশে বিভিন্ন অনাচার ও অনিয়মের বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং অতি সম্প্রতি বেসামরিক লেবাসে সামরিক স্বৈরাচারী সরকারবিরোধী আন্দোলনে এদেশের রাজনৈতিক দলগুলো যখন খাবি-খাচ্ছিলো ঠিক তখন সকল অনৈক্যকে ঝেড়ে মুছে 'সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য' গঠন করার মধ্য দিয়ে স্বৈরাচারকে হটিয়ে এদেশের মানুষের অকুণ্ঠ ভালবাসা আর তেজোদীপ্ত ভূমিকা রেখেছিলো এই বাংলার ছাত্রসমাজ। আজ তাদের এই সন্ত্রাসী ভূমিকায় ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে তাদের সব অতীত ঐতিহ্য।

অতীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ এবং তৎপরতার জন্য স্বৈরাচারী সরকারকে দায়ী করা হতো। স্বৈরাচারী সরকার তার অবৈধ কার্যকলাপ দ্বারা যাতে জনরোষে না পড়েন, এ জন্যই সুকৌশলে দেশের শিক্ষাঙ্গনগুলোতে সন্ত্রাসবাদকে উস্কে দিতো। এমন অভিযোগ রাজনৈতিক দলগুলো অহরহ করতো যে সরকার ছাত্র-রাজনীতি বন্ধের জন্য সরকার সন্ত্রাসীদের লালন করতো এবং ইচ্ছে মাফিক সন্ত্রাসী কার্যকলাপ পরিচালনা করে দেশের প্রধান, প্রধান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ ঘোষণা করত।

এ দেশের ছাত্রসমাজ এখন তাদের সমস্ত ষড়যন্ত্রকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে সাধারণ মানুষদের নিয়ে যে গণ-আন্দোলন গড়ে তোলে, তার ফসল আজকের গণতান্ত্রিক সরকার। আজ যখন সুস্থ গণতান্ত্রিক পরিবেশে বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অব্যাহত সন্ত্রাস ও পতাকা উড়িয়ে গোলাগুলির সচিত্র প্রতিবেদন পত্রিকার পাতায় দেখা যায়, তখন এর দায়দায়িত্ব এবং সন্ত্রাস দমনে অতীত সরকারের মত বর্তমান সরকারের ব্যর্থতাও স্পষ্ট চোখে পড়ে। যা বর্তমান গণতান্ত্রিক পরিবেশে কারো কাম্য হতে পারে না।

আজকে একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ও ছাত্র-সংঘর্ষের কারণে ইতিমধ্যে যে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষিত হয়েছে, তার প্রত্যেকটির সাথেই সরকারী ছাত্র সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল সরাসরি যুক্ত। এবং কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই ছাত্র-সংঘর্ষ এবং সন্ত্রাসী তৎপরতার জন্য অতিযুক্তও বটে।

বিগত সংসদ নির্বাচনে সাধারণ মানুষের অনুমানকে মিথ্যে প্রমাণিত করে বেগম খালেদা জিয়ার জাতীয়তাবাদী দলকে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী হতে যে সংগঠনটি সবচেয়ে শক্তিশালী শক্তি বা ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করেছে, তা হচ্ছে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল। বলতে দ্বিধা নেই সারাদেশে এই সংগঠনটির অগ্রযাত্রা সত্যিই ঈর্ষণীয়। কিন্তু এই সংগঠনটির জন্মলগ্ন থেকে আজ অবধি পর্যালোচনা করলে যে জিনিসটি লক্ষণীয় তা হলো সংগঠনটির সন্ত্রাসী তৎপরতা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদলের এক সময়ের ডাকসাইটে নেতা নীরু, বাবলু, অভিসহ ইলিয়াস, রফিক প্রমুখ অস্ত্রধারীদের নেতৃত্বে

বিভিন্ন সময়ে পেশীশক্তি প্রদর্শন দ্বারা তারা ক্যাম্পাসে আধিপত্য বিস্তার করেছে এমন রিপোর্ট পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। সেই সময়ে বিরোধী ছাত্র সংগঠন হওয়ার কারণে সাধারণ মানুষের সেন্টিমেন্টও তাদের পক্ষে ছিলো। কিন্তু আজ তারা সরকারী দলের ছাত্র সংগঠন। বাংলাদেশের ইতিহাসের পাতা ওল্টালে দেখা যায়, সরকারী ছাত্র সংগঠন কখনই তাদের শক্তিশালী সাংগঠনিক অবস্থানকে ধরে রাখতে সক্ষম হয়নি। আর সেই ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আগামীতে ছাত্রদলের সাংগঠনিক অবস্থান নড়বড় হলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু সেই সংগঠনটি যদি তাদের পূর্বের অবস্থানকে ধরে রাখবার জন্য অতীতের সেই সন্ত্রাসী কার্যকলাপকে প্রাধান্য দেয়, তাহলে তা প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে যায়। যেহেতু তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত।

দেশের বিভিন্নস্থানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে অব্যাহত এই ছাত্র-সংঘর্ষ বন্ধে সরকারের ব্যর্থতা স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। সন্ত্রাস দমনের উপায় খুঁজে বের করার নামে রাজনৈতিক দলসমূহের মহাসমাবেশ আহবান করা ছাড়া এ ব্যাপারে সরকারের গৃহীত ব্যবস্থা উল্লেখ করার মত নয়। সম্প্রতি সংসদে বিরোধীদলীয় নেত্রী গোপালগঞ্জে এক জনসভায় বলেছেন, সরকার ইচ্ছা করলে কয়েক ঘন্টার মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের শিক্ষাঙ্গনগুলোতে সন্ত্রাস বন্ধ করতে পারে। সন্ত্রাস দমনও অবৈধ অস্ত্রধারীদের গ্রেফতার করার ব্যাপারে সরকারের ব্যর্থতার পাশাপাশি সরকারের সদিচ্ছার অভাবও পরিলক্ষিত হয়।

জাতিগঠন এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার এই ক্রান্তিকালে দেশের রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর উচিত তাদের স্ব-স্ব ছাত্র সংগঠন থেকে অস্ত্রধারীদের বহিষ্কার করা কিংবা বর্জন করা। কিন্তু সে ক্ষেত্রে কোন কোন সংগঠন থেকে যদি এই অস্ত্রধারীদের পৃষ্ঠপোষকতা করা হয়। অস্ত্রধারীরা সন্ত্রাসী কার্যকলাপ পরিচালনার লাইসেন্স প্রাপ্ত হয়, তাহলে তাদের এই অবৈধ সন্ত্রাসী কার্যকলাপের নিকট সাধারণ ছাত্রছাত্রীসহ শিক্ষকরাও জিম্মি হয়ে পড়েন। এর বাস্তব চিত্র চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধবিরোধী জামাত-শিবির গোষ্ঠী বেশ কয়েক মাস যাবত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থার সৃষ্টি করে রেখেছে। সেখানে শিবিরের তথাকথিত 'সিরাজুস-সালেহীন' নামক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অবৈধ অস্ত্রধারীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করে বিরোধী ছাত্র থেকে শুরু করে শিক্ষকবৃন্দ এমনকি উপাচার্যকে পর্যন্ত হত্যার হুমকি দেওয়ার আস্পর্ধা দেখাচ্ছে। স্থানীয় প্রশাসনের নির্লিপ্ততা এবং বর্তমান সরকারের ক্ষমতার অংশীদার হিসেবে ছাত্র শিবির সেখানে 'উপাচার্য হটাও'-এর নামে যখন তখন বিশ্ববিদ্যালয়কে অস্ত্রের মুখে অচল করে দিচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে অবৈধ অস্ত্রধারীরা তাদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত করেছে।

শুধু চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় নয়, রংপুর কারমাইকেল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েও এই শিবির গোষ্ঠী তাদের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালিয়েছে। ইসলামের নামে এরা হত্যা করেছে অনেক তরুণ মেধাবী প্রগতিশীল ছাত্রনেতাদেরকে। বর্তমান সরকার তাদের সাথে গাঁটছড়া বেঁধে ক্ষমতাসীন হওয়ার কারণে তাদের বিভিন্ন অপকর্মকে হজম করে নিজেদের শোচনীয় ব্যর্থতাকে জনসমক্ষে তুলে ধরছে।

শিবিরের দখলীকৃত শিক্ষাঙ্গনগুলোতে পৃষ্ঠপোষকতাকারী তাদের মাতৃসংগঠন জামাত-এর মহাসচিব যখন 'সন্ত্রাস প্রতিরোধের' মহাসমাবেশে সন্ত্রাস বন্ধের বক্তব্য রাখেন এবং নিজ নিজ সংগঠন থেকে অস্ত্রধারীদের প্রত্যাহারের অমোঘ বাণী উপস্থাপন করেন, তখন মূলতঃ মহাসমাবেশটি লোক দেখানো মহাসমাবেশ হিসেবে পর্যবেক্ষকমহলের নিকট প্রতিভাত হয়।

শিক্ষাঙ্গনগুলোতে সন্ত্রাসী তৎপরতার জন্য দায়ী অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের এবং হাজার হাজার রাউন্ড গুলির উৎস সম্পর্কে এই মুহূর্তেই জাতীয় নেতৃবৃন্দকে অবহিত হতে হবে। এবং সেই উৎসসমূহ বন্ধের ব্যাপারে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। শিক্ষাঙ্গনে যে কালো মেঘের আবরণ পড়েছে, তার ফলাফল সুদূরপ্রসারী এবং অবশ্যম্ভাবী জাতীয় জীবন এবং জাতীয় অস্তিত্বের প্রতি অচিরেই তা হুমকি হয়ে দাঁড়াবে।

জাতীয় অস্তিত্বের প্রশ্নে সন্ত্রাস দমনে সরকারের সদিচ্ছার পাশাপাশি দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর সহযোগিতা একান্ত কাম্য। অর্থনৈতিক দূরবস্থা, আইন শৃংখলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতির ফলে জনজীবনে যে দুর্ভোগ এসেছে, শিক্ষাঙ্গনগুলোর অস্থিতিশীল অবস্থা, ছাত্র-সংঘর্ষ তাতে নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে। আর গণতন্ত্রবিরোধী এবং প্রশাসনের ভিতর ঘাপটি মেরে থাকা স্বৈরাচারের দোষররা নতুন করে ষড়যন্ত্র শুরু করে দিয়েছে। তারা গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার বিপক্ষে তাদের মনোভাব ইতিমধ্যেই জনগণের নিকট ব্যক্ত করেছে।

'৯০-এ 'স্বৈরাচার হটাও' আন্দোলনে তিনটি জোট নিয়ামক কমিটি গঠনের মাধ্যমে তৎকালীন সরকারের ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে রূপরেখা প্রণয়ন ও স্বাক্ষরসহ যে ঐকমত্যে পৌঁছেছিল, শিক্ষাঙ্গনগুলোতে সুস্থাবস্থা ফিরিয়ে আনতে এবং জাতীয় অস্তিত্বের প্রশ্নে আজ সেই ধরনের ঐকমত্যের প্রয়োজন। তা না হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অভ্যন্তরে গণতন্ত্রবিরোধীরা তাদের এজেন্ট ঢুকিয়ে দিয়ে তাদের ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে স্থায়ী সংকটময় পরিস্থিতি সৃষ্টির সাথে সাথে নব প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রকেও বিপন্ন করতে পারে। আর সেক্ষেত্রে শিক্ষাঙ্গনে বিরাজমান সংকট এর পাশাপাশি রাজনৈতিক অঙ্গনেও অস্থিরতার কারণে জাতীয় অস্তিত্ব বিপন্ন হতে বাধ্য।

দিবাকর পালঃ গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

05 AUG 1991